১। প্রশ্নঃবাংলাদেশের নৃতাত্বিক পরিচয় দাও ?

উঃ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল রাষ্ট্র, যেখানে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। নৃতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জনগণ একটি মিশ্র জাতি হিসেবে বিবেচিত। এদেশের ইতিহাস, ভূগোল ও পরিবেশ এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে এখানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করে আসছে। তাই বাংলাদেশের নৃতাত্বিক পরিচয় একক নয়, বরং তা বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময়।

১. নৃতাত্বিক পরিচয়ের সংজ্ঞা:
নৃতাত্বিক (Ethnic) পরিচয় বলতে বোঝায় একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টিকে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব পরিচিতি, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা এবং জীবনধারা থাকে যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে তোলে।

২. বাংলাদেশের নৃতাত্বিক গঠন:
বাংলাদেশের প্রধান নৃতাত্বিক গোষ্ঠী হলো বাঙালি। তবে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বহু ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য নিয়ে আজও টিকে আছে। broadly, এদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

ক. বাঙালি জাতিগোষ্ঠী:
বাংলাদেশের প্রায় ৯৮% মানুষ বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
বাঙালিরা মূলত আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং মঙ্গোলয়েড জাতির সংমিশ্রণ।
এদের মাতৃভাষা বাংলা এবং ধর্মভিত্তিতে বাঙালিদের মধ্যে রয়েছে:
মুসলমান বাঙালি
হিন্দু বাঙালি
খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী:
বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির বেশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। এদের নিজস্ব ভাষা, পোশাক, রীতি-নীতি ও ধর্ম রয়েছে। যেমন:

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা

সমতলের জনগোষ্ঠী: সাঁওতাল, গারো, ওঁরাও, কোচ, রাজবংশী, মুন্ডা, হাজং

৩. নৃগোষ্ঠীভিত্তিক বাংলাদেশের বৈচিত্র্য:
ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের গোষ্ঠীগুলি:

এ অঞ্চলের মানুষ মঙ্গোলয়েড বংশোদ্ভূত। তাদের ভাষা তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এখানে কয়েকটি গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য:

চাকমা: সংখ্যায় সর্বাধিক। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৈসাবি তাদের প্রধান উৎসব।

মারমা: মায়ানমার থেকে আগত জাতি। বৌদ্ধ, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

ত্রিপুরা: প্রধানত খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বসবাস। কৃষিকাজে পারদর্শী।

ম্রো, বম, খিয়াং: পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী।
খ. সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী:
তারা প্রধানত রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলে বসবাস করে।

সাঁওতাল: অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী। হিন্দু ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মে বিশ্বাসী।

গারো: ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় প্রধানত বসবাস। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

ধর্মীয় বৈচিত্র্য:

বাংলাদেশে ধর্মের ভিত্তিতেও নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতা রয়েছে। প্রধান ধর্মগুলো হলো:

ইসলাম – বাঙালি মুসলমানরা

হিন্দু ধর্ম – বাঙালি হিন্দু ও কিছু আদিবাসী

বৌদ্ধ ধর্ম – চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা

খ্রিস্টান ধর্ম – গারো, সাঁওতাল, কোচ প্রভৃতি

সরকারের পদক্ষেপ ও সংবিধানিক স্বীকৃতি:

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আদিবাসীদের জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সরকার এবং এনজিও সমূহ এখন এদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
উপসংহার:

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এক বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় বাস্তবতা। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে সংখ্যালঘু কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বহু নৃগোষ্ঠী এ দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। তাদের স্বীকৃতি, অধিকার ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একাত্মতা, সহাবস্থান ও বহুত্ববাদ এদেশের সামাজিক শক্তির মূলভিত্তি।

২ । প্রশ্নঃ বাংলাদেশের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনধারায় ভূপ্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করো?

উঃ বাংলাদেশের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনধারায় ভূপ্রকৃতির প্রভাব
বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এর অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনধারার ওপর সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসেবে এর সমতল ভূমি, নদ-নদী, পলিমাটি এবং সীমিত পাহাড়ি অঞ্চল মানুষের পেশা, বাসস্থান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি জীবনযাপনের ধরনকেও প্রভাবিত করেছে।
১. কৃষিকাজ ও অর্থনীতিতে প্রভাব:
উর্বর সমভূমি: বাংলাদেশের প্রায় ৮০% এলাকা পলল সমভূমি। এই উর্বর পলিমাটি কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এখানকার প্রধান ফসল ধান (বিশেষ করে আউশ, আমন, বোরো), যা বাঙালির প্রধান খাদ্য। এছাড়া, পাট, গম, আলু, ডাল, তেলবীজ, শাকসবজি এবং ফলমূল উৎপাদনেও এই সমভূমি গুরুত্বপূর্ণ।
নদীভিত্তিক কৃষি: অসংখ্য নদ-নদী সেচ সুবিধা প্রদান করে, যা কৃষকদের সারা বছর চাষাবাদে সহায়তা করে। বিশেষ করে বর্ষাকালে নদীর পানি প্লাবনভূমিতে পলি জমিয়ে মাটিকে আরও উর্বর করে তোলে।
মৎস্যসম্পদ: নদী, খালবিল ও হাওড়-বাঁওড় মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। মাছ ধরা বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহের উৎস এবং বাঙালির খাদ্যতালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য উপাদান।
ফসল বৈচিত্র্য: পাহাড়ি অঞ্চলে চা, আনারস, রাবার, আদা, হলুদ ইত্যাদি চাষ হয়, যা সমভূমির ফসল থেকে ভিন্ন এবং অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনে।
২. বসতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভাব:

ব-দ্বীপের বসতি: নদী এবং নিচু ভূপ্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ বসতি ঘনবসতিপূর্ণ এবং নদী তীরবর্তী। মানুষ নদীকে কেন্দ্র করে তাদের বসতি গড়ে তোলে। বন্যা থেকে রক্ষার জন্য অনেক বসতবাড়ি উঁচু ভিটার উপর তৈরি করা হয়।

নদীপথের গুরুত্ব: অসংখ্য নদ-নদী দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। নৌপথ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে যেখানে সড়ক বা রেলপথের অবকাঠামো কম উন্নত। এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: নিচু ও সমতল ভূমির কারণে বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এসব দুর্যোগ প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, কৃষিজমির ক্ষতি করে এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, যা আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

৩. সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব:
নদীমাতৃক সংস্কৃতি: ভূপ্রকৃতি এবং নদ-নদীর প্রভাব বাঙালির সংস্কৃতিতে গভীরভাবে মিশে আছে। নদীকে কেন্দ্র করে লোকগান, লোককথা, মেলা, উৎসব এবং নৌকা বাইচের মতো ঐতিহ্যবাহী খেলার বিকাশ ঘটেছে।

সহনশীলতা ও অভিযোজন: প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে এক ধরনের সহনশীলতা এবং প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা তৈরি করেছে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার কারণে মানুষের জীবনযাত্রাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন: হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা পাহাড়ি বা সমতল অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা থেকে ভিন্ন।

৪. পেশা ও জীবিকায় প্রভাব:
কৃষিভিত্তিক পেশা: জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষক, জেলে, মাঝি, দিনমজুর ইত্যাদি পেশা ভূপ্রকৃতি দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত।

শহরমুখীতা: বন্যা, নদী ভাঙন এবং সীমিত কৃষিজমির কারণে অনেকে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হয়, যা নগরায়ণ এবং বস্তি এলাকার প্রসারে ভূমিকা রাখে।

পর্যটন: সুন্দরবন, কুতুবদিয়া, সেন্টমার্টিন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও লেক পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন আয়ের উৎস তৈরি করছে।

৫. পরিবেশগত প্রভাব:
জীববৈচিত্র্য: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছে, যা জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে (যেমন: সুন্দরবন ও এর ম্যানগ্রোভ বন)।

মাটির ধরন: পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর হলেও, কিছু স্থানে লবণাক্ততা, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে, কৃষিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।
উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের নদীবিধৌত ব-দ্বীপ সমভূমি একদিকে যেমন কৃষিসমৃদ্ধি এনেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও বাড়িয়েছে। এই ভূপ্রকৃতিই এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, জীবিকা, বসতি স্থাপন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি। এর প্রভাবে মানুষের মধ্যে এক ধরনের অভিযোজন ক্ষমতা ও সহনশীলতার বিকাশ ঘটেছে, যা তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়।
আপনার কি বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বা এর জীবনধারা সম্পর্কে আরও কিছু জানার আছে?

৩। প্রশ্নঃ লাহেরা প্রস্তাবের পটভূমি আলোচনা করো। লাহোরা প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য কি ছিল ?
উঃলাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

লাহোর প্রস্তাব, যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। এর পটভূমিতে ছিল ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের অধিকার নিয়ে উদ্বেগ।
১. মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া ও অসন্তোষ: ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলিমরা শিক্ষা ও রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়ে। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতো নেতারা মুসলিমদের সচেতন করেন।
২. মুসলিম লীগ গঠন (১৯০৬): মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায় গঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
৩. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা: ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন করা হয়, যা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পরিচিতি দেয়।
৪. কংগ্রেসের আচরণ: ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করে, যা মুসলিম নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করে। তারা মনে করেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে মুসলিমদের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়।
৫. সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা: মুসলিম নেতারা অনুভব করেন, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে।
৬. আল্লামা ইকবালের ধারণা: ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা দেন।
এই সকল কারণ মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে।
লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য
শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল:
১. স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (Independent States) গঠন: ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে (যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমা পরিবর্তন করে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব: এই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক ইউনিটগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।
৩. সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে অমুসলিম এবং মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে।
এই প্রস্তাবই পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যদিও 'রাষ্ট্রসমূহ' শব্দটির বহুবচন নিয়ে বিতর্ক ছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি একক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

৪। প্রশ্নঃঅখন্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করো । অখন্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?
উঃ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলা প্রদেশকে একটি একক, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করা থেকে রক্ষা করা। সেই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ বাঙালি নেতাদের সাথে মিলে এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন।
এই পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলো হলো:
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা: বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং এটি ভারত বা পাকিস্তানের কোনটিরই অংশ হবে না।

যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার: নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, আইনসভার নির্বাচন হবে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।
ক্ষমতা বণ্টন: মন্ত্রিসভার অর্ধেক সদস্য হবেন মুসলিম এবং বাকি অর্ধেক হিন্দু (তফসিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত)। মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন হিন্দু।
সম্পর্ক নির্ধারণ: স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।
অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ
এই পরিকল্পনাটি কয়েকটি কারণে ব্যর্থ হয়:

মুসলিম লীগের বিরোধিতা: মুসলিম লীগের অনেক নেতা, বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এই পরিকল্পনায় পূর্ণ সমর্থন দেননি। যদিও প্রাথমিকভাবে তিনি এই প্রস্তাবে কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণাকেই অগ্রাধিকার দেন। বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যে খাজা নাজিমউদ্দিনের মতো প্রভাবশালী নেতারাও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।
কংগ্রেসের বিরোধিতা: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেল, এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা মনে করেছিলেন যে এই ধরনের একটি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র ভবিষ্যতে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।
* হিন্দু সম্প্রদায়ের ভয়: বাংলার হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতারা এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে একটি স্বাধীন বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হওয়ায় হিন্দুরা মুসলিম শাসনের অধীনে চলে যাবে। তাই তারা ভারতের মধ্যে একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের পক্ষে ছিলেন।
* ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর দাঙ্গা এবং তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে গভীর অনাস্থা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গাগুলো প্রমাণ করে যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কতটা কঠিন।

নেতৃত্বের বিভাজন: সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর মতো নেতারা এই পরিকল্পনার পক্ষে থাকলেও, তাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে অনেকেই এই ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপও এই বিভাজনকে বাড়িয়ে তোলে।

ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান: ব্রিটিশ সরকার, বিশেষ করে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন, দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তারা দেশভাগের পরিকল্পনাকে সহজ সমাধান হিসেবে দেখেছিলেন এবং একটি অখণ্ড স্বাধীন বাংলার মতো জটিল প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার মতো সময় ও আগ্রহ তাদের ছিল না। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোনো একটি প্রদেশের আইনসভার অর্ধেক সদস্যও যদি প্রদেশ ভাগের পক্ষে মত দেয়, তবে তা বিভক্ত হবে। এই শর্তের কারণে বাংলাকে ভাগ করা সহজ হয়ে যায়।
এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত প্রভাবে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়।

৫। প্রশ্নঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও গুরুত্ব আলোচনা করো ?

উঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি
১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল—পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাঙালি এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান ভাষা ছিল উর্দু।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে এবং উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য: শুধু ভাষাগত বৈষম্যই নয়, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণ করছিল। বাঙালিরা অনুভব করেছিল যে তাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় হুমকির মুখে।

গণতান্ত্রিক অধিকারের অভাব: কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা। বাঙালিরা বুঝতে পারছিল যে ভাষা রক্ষার আন্দোলন আসলে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন।

আন্দোলনের সূচনা: জিন্নাহর ঘোষণার পর থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়। এর সূত্র ধরে ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন একই ঘোষণা দিলে আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। ভাষা

আন্দোলনের এই পটভূমিতেই ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেন।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব
ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর গুরুত্বগুলো হলো:

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম: ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। এই আন্দোলনই প্রমাণ করে যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

স্বাধীনতার বীজ বপন: ভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতির প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ। এটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তীতে ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ—এসবের প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।
ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা: এই আন্দোলনের ফলেই বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এটি শুধু ভাষার স্বীকৃতি ছিল না, বরং বাঙালি সংস্কৃতি ও পরিচয়েরও স্বীকৃতি ছিল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি: ২১শে ফেব্রুয়ারি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। এটি বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে।
গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা: ভাষা আন্দোলন ছিল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এটি প্রমাণ করে যে বাঙালিরা তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।
সংক্ষেপে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অস্তিত্ব, পরিচয় এবং অধিকার রক্ষার এক সাহসী সংগ্রাম। এটি শুধু একটি ভাষার আন্দোলন ছিল না, বরং একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ছিল।

৬। প্রশ্নঃ মৌলিক গণতন্ত্র কি ? আইয়ুব খানের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো ।
উঃ মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy)
মৌলিক গণতন্ত্র ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে প্রবর্তিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে চালু করা হয়। এটি ছিল এক ধরনের সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শাসনের বৈধতা দেওয়া এবং জনগণের অংশগ্রহণকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
মৌলিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য:
* চার স্তরের কাঠামো: এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল—এই চারটি স্তর ছিল।
* ৮০,০০০ সদস্য: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং তাদের বলা হতো "মৌলিক গণতন্ত্রী"।
* ভোটার হিসেবে কাজ: এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীরা শুধু স্থানীয় উন্নয়নের কাজই করতেন না, বরং তারা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য ভোটার হিসেবেও কাজ করতেন।
* নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা: মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের ক্ষমতা সীমিত করা হয়। সাধারণ জনগণ সরাসরি প্রেসিডেন্ট বা আইনসভার সদস্য নির্বাচন করতে পারতেন না।
* সামরিক শাসনের ভিত্তি: এই ব্যবস্থা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এর মাধ্যমে তিনি তার ক্ষমতাকে জনগণের অংশগ্রহণের মোড়কে বৈধতা দিতে চেয়েছিলেন।
আইয়ুব খানের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য
১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। তার শাসনামলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল:
* সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার: আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। তার শাসনকাল ছিল এক ধরনের স্বৈরাচারী শাসন, যেখানে রাজনৈতিক দল ও স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত ছিল।
* মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন: ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। এটি ছিল তার শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে তিনি সীমিত আকারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

* অর্থনৈতিক বৈষম্য: তার শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক শিল্পায়ন হলেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত থাকে।
* উন্নয়ন দশক: আইয়ুব খানের শাসনকালকে "উন্নয়ন দশক" (Decade of Development) হিসেবে প্রচার করা হয়। এ সময় কিছু বড় শিল্প ও অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে।
* ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫): ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইয়ুব সরকার ব্যর্থ হয়, যা বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়।
* ছয় দফা আন্দোলনের সূত্রপাত: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এটি ছিল আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক আন্দোলন।
* ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: ১৯৬৯ সালে তার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান হয়, যার ফলে তিনি ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানের কাঠামোগত দুর্বলতা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।

৭. প্রশ্নঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি সমূহ আলোচনা করো ?
উঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যমূলক নীতি দেখা যায়। এই বৈষম্যগুলো মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোষণ করার উদ্দেশ্য থেকে তৈরি হয়েছিল।
অর্থনৈতিক বৈষম্য
পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে বড়। পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক এবং এখানকার উৎপাদিত পাট ও চা ছিল দেশের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু এই আয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো।
* বাজেট বরাদ্দ: দেশের মোট রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ আসতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের বেশিরভাগ অংশ বরাদ্দ করত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। সামরিক ও বেসামরিক উভয় খাতেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি বরাদ্দ পেত।
* উন্নয়ন প্রকল্প: বড় বড় শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছিল। ফলে সেখানে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব পাকিস্তান এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণও মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যবহার করা হতো।
* বাণিজ্য: পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন পাট ও চা থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পপণ্য আমদানি করা হতো। আন্তঃপ্রদেশ বাণিজ্যেও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হতো।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য
পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের বেশি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক পদে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম।
* প্রশাসনিক পদ: কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সচিব, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বাঙালিদের এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হতো না বললেই চলে।
* সামরিক বাহিনী: সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। বেশিরভাগ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সৈন্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সামরিক খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হতো।
* শাসন ক্ষমতা: পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি।
সাংস্কৃতিক বৈষম্য
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে একটি একক পাকিস্তানি সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।
* ভাষা: সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ।
* শিক্ষা ও সাহিত্য: শিক্ষা খাতেও পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। এছাড়া, রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া এবং বাংলা লেখার জন্য রোমান হরফ প্রবর্তনের মতো সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

এই বৈষম্যমূলক নীতিগুলোই শেষ পর্যন্ত বাঙালির মধ্যে গভীর অসন্তোষ তৈরি করে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, যা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

৮. প্রশ্নঃ ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করো ?
উঃ ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় প্রতিবাদ হিসেবে ধরা হয়। এই আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।
পটভূমি
১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর, তিনি একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৬২ সালে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়, যা 'শরিফ কমিশন রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে এমন কিছু প্রস্তাব ছিল যা ছিল বৈষম্যমূলক এবং গণবিরোধী।
শরিফ কমিশনের প্রস্তাবনার মূল বিষয়:
* উচ্চশিক্ষা সীমিতকরণ: উচ্চশিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে সাধারণ ছাত্রদের নাগালের বাইরে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল।
* শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনার প্রস্তাব করা হয়। এতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রশস্ত হয়।
* মেয়াদ বৃদ্ধি: ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ দুই বছর থেকে তিন বছরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়।
* উর্দু ও ইংরেজি: বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দু ও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিস্তার
শরিফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এই শিক্ষানীতিকে বৈষম্যমূলক এবং শিক্ষার অধিকার হরণের অপচেষ্টা হিসেবে দেখতে পায়।
* আন্দোলনের শুরু: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। তারা 'শরিফ কমিশন রিপোর্ট বাতিল চাই' স্লোগান তুলে আন্দোলন গড়ে তোলে।
* প্রতিরোধ দিবস: ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়। এই দিন পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে কয়েকজন ছাত্র নিহত হন, যা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। শহীদদের মধ্যে ছিলেন বাবুল, গোলাম মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখ।
* আন্দোলনের ফলাফল: ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সরকার নতিস্বীকার করে। কিছু কিছু প্রস্তাব যেমন ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়।
গুরুত্ব
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যেকোনো অন্যায় ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম। এই আন্দোলন পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এই কারণে ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে এখন 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

৯। প্রশ্নঃ ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় । ব্যাখ্যা কর

উঃ ছয় দফা কর্মসূচিকে 'বাঙালির ম্যাগনাকার্টা' বা 'মুক্তির সনদ' বলা হয় কারণ এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই ছয় দফা কর্মসূচিকে ইংরেজদের 'ম্যাগনাকার্টা'র সাথে তুলনা করা হয়, যেখানে রাজা জনের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে সীমিত করে প্রজাদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। একইভাবে, ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট দাবি।
কেন একে ম্যাগনাকার্টা বলা হয় তার প্রধান কারণগুলো হলো:
* স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তি: ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেছিল। এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব।
* গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: এটি তৎকালীন সামরিক শাসনের অধীনে থাকা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার পথ খুলে দিয়েছিল। ছয় দফায় সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন দাবি করা হয়।

* অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান: ছয় দফা কর্মসূচিতে আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থা, পৃথক রাজস্ব নীতি এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে পুঁজি পাচার রোধের প্রস্তাব করা হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত করার সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
* স্বাধীনতার সোপান: ছয় দফা সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও, এর মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি জানানো হয়েছিল, তা ছিল কার্যত স্বাধীনতারই প্রথম ধাপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছিলেন, "সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।" এই ছয় দফাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীতে এক দফা তথা স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান হয়।
* জনগণের ব্যাপক সমর্থন: এই কর্মসূচি শুধু বুদ্ধিজীবী বা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি দ্রুত সাধারণ জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলে এটি একটি জনসমর্থিত আন্দোলনে পরিণত হয়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।
সংক্ষেপে, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়, অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সহায়তা করে। এই কারণেই এটি 'বাঙালির ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত।

১০. প্রশ্নঃ ১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনের ১১দফা কর্মসূচি আলোচনা করো ?

উঃ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ছাত্রসমাজ কর্তৃক ঘোষিত ১১ দফা কর্মসূচি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল, যা ছয় দফার ধারাবাহিকতায় ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের দাবিগুলোকে একত্রিত করেছিল। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" এই কর্মসূচি ঘোষণা করে।
১১ দফার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:
১. শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার: শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধান, শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা, বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রদের উপর থেকে সব ধরনের নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করা।
২. সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৩. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন: ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৪. ফেডারেল সরকার: পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন।
৫. শিল্প জাতীয়করণ: ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।
৬. কৃষকদের অধিকার: কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা কমানো এবং পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা।
৭. শ্রমিকদের অধিকার: শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার নিশ্চিত করা।
৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ: পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. নির্যাতনমূলক আইন বাতিল: নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।
১০. নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি: সিয়াটো (SEATO) ও সেন্ট্রো (CENTRO) সহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে একটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা।
১১. রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া।
এই ১১ দফা কর্মসূচি ছিল ছয় দফার একটি বিস্তৃত রূপ, যা শুধু রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিই নয়, বরং শিক্ষা, অর্থনীতি, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকারের মতো জনজীবনের বিভিন্ন দিককেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এই কর্মসূচিই মূলত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে মসৃণ করে।

১১. প্রশ্নঃ ১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনের ১১দফা কর্মসূচি আলোচনা করো ?
উঃ ভূমিকা

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অবিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়ন এবং সামরিক শাসনের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতে একত্রিত হয়।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির রাজনৈতিক মুক্তির রূপরেখা। কিন্তু তাতে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলো পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছয় দফার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচি স্বাধীনতার আন্দোলনে নতুন গতি এনে দেয়।

১১ দফার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:
১. শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার: শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধান, শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা, বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রদের উপর থেকে সব ধরনের নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করা।
২. সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৩. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন: ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৪. ফেডারেল সরকার: পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন।
৫. শিল্প জাতীয়করণ: ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।
৬. কৃষকদের অধিকার: কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা কমানো এবং পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা।
৭. শ্রমিকদের অধিকার: শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার নিশ্চিত করা।
৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ: পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. নির্যাতনমূলক আইন বাতিল: নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।
১০. নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি: সিয়াটো (SEATO) ও সেন্ট্রো (CENTRO) সহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে একটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা।
১১. রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া।
এই ১১ দফা কর্মসূচি ছিল ছয় দফার একটি বিস্তৃত রূপ, যা শুধু রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিই নয়, বরং শিক্ষা, অর্থনীতি, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকারের মতো জনজীবনের বিভিন্ন দিককেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এই কর্মসূচিই মূলত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে মসৃণ করে।

১২. প্রশ্নঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তি বা পরশক্তির ভূমিকা আলোচনা করো ?
উঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি আঞ্চলিক সংঘাত থেকে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের (Cold War) বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি পরাশক্তি তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী অবস্থান নিয়েছিল। এই ভূমিকাগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী এবং যুদ্ধের গতিপথকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।
সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) ও ভারত: বাংলাদেশের মিত্র শক্তি
ভারত: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও সহায়ক। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন।
* শরণার্থী ও মানবিক সহায়তা: পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার মুখে প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করে।
* মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ: ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, আশ্রয় এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল রপ্ত করে।
* আন্তর্জাতিক সমর্থন: ভারত কূটনৈতিকভাবে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় সেনাবাহিনী মিত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্রুত বাংলাদেশকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে।
* সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা: তৎকালীন দুই পরাশক্তির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন: বাংলাদেশের বিরোধী শক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পক্ষে শক্ত অবস্থান নেন।
* রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করে। তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গণহত্যা বন্ধের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।
* সামরিক সহায়তা: যদিও মার্কিন সরকার সরাসরি সামরিক সহায়তা পাঠায়নি, তবে তারা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখে।
* সপ্তম নৌবহর প্রেরণ: ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ভারতকে ভয় দেখাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরের দিকে তাদের পারমাণবিক শক্তিধর সপ্তম নৌবহর (Task Force-74) পাঠায়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাল্টা নৌবহর প্রেরণের হুমকির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটতে বাধ্য হয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন: চীন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। মূলত চীন-ভারত বৈরিতার কারণে তারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল।
* কূটনৈতিক সমর্থন: চীন জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের হুমকি দেয়।
* আদর্শিক কারণ: তৎকালীন সময়ে চীনের মাওবাদী আদর্শের সঙ্গে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধ ছিল। চীন মনে করত, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জোট দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের প্রভাব কমাতে পারে। তাই নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পক্ষ নেয়।

১৩. প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান আলোচনা করো ?

উঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল বহুমুখী এবং অপরিহার্য। এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলা হয়, কারণ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ—পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও—নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের এই অবদানকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:
১. প্রত্যক্ষ যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে
অনেকেই অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে (যেমন, গোবরা ক্যাম্প) অনেক নারীকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।
* উল্লেখযোগ্য নারী মুক্তিযোদ্ধা: তারামন বিবি (বীর প্রতীক), কাঁকন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, রওশন আরা প্রমুখ।
* সংগঠক হিসেবে: সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম সুফিয়া কামাল, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম প্রমুখ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে এবং সহযোগিতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
২. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদান
দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নারী নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন তথ্য আদান-প্রদান, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা এবং শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করেছেন।
৩. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও জনমত গঠনে
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারী শিল্পীরা গান, কবিতা ও কথিকা পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সাধারণ মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এছাড়া, অনেকেই দেশের বাইরে জনমত গঠনে এবং তহবিল সংগ্রহে কাজ করেছেন।
৪. চিকিৎসা ও সেবাদান
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য অনেক নারী ডাক্তার, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। ডা. সেতারা বেগম (বীর প্রতীক) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
৫. বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগ
মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাবিধুর অবদান হলো পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া। এই নারীদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের "বীরাঙ্গনা" উপাধি দেন। এই ব্যাঙ্গনাদের অগণিত ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।
সংক্ষেপে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়ে নারীসমাজ বিভিন্ন ভূমিকায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের এই অবদান শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল দেশের প্রতিটি ঘর ও প্রান্ত থেকে স্বাধীনতার জন্য এক নীরব ও বিশাল আত্মত্যাগ।

১৩. প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি নিবন্ধন লিখ ?
উঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। এই যুদ্ধ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।
পটভূমি: শোষণ ও বৈষম্যের ২৩ বছর
১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার ওপর আঘাত (১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন), সম্পদের অসম বণ্টন, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে বাঙালিদের সীমিত অংশগ্রহণ, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ—এই সবকিছুই বাঙালির মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ।
মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর থেকেই শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকা শহরে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার পরপরই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনীর সহযোগিতা
বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর পরই শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। দেশের আপামর জনগণ যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। ভারত সরকার ও জনগণ এই সংগ্রামে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে মিত্রবাহিনী (ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনী) গঠিত হয়। এই যৌথ বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হতে থাকে।
মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও আত্মত্যাগ
মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এর মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়। এই বিজয়ের পেছনে ছিল ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন আত্মত্যাগ।
মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি সামরিক বিজয় ছিল না, এটি ছিল একটি জাতির আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিজয়। এই যুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে ঐক্য, আত্মত্যাগ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজও আমাদের দেশপ্রেম ও জাতিসত্তা বিকাশের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৪. প্রশ্নঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করো ?
উঃ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান, যা বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
১. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো চারটি মূলনীতি:
* জাতীয়তাবাদ: ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি।
* সমাজতন্ত্র: শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করা।
* গণতন্ত্র: জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
* ধর্মনিরপেক্ষতা: ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা এবং সকল ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা।
২. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার
সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হলেও, প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।
৩. জনগণের সার্বভৌমত্ব
সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৪. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র
বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যেখানে কোনো প্রদেশ বা রাজ্য বিভাজন নেই এবং দেশের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত।
৫. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, অর্থাৎ জাতীয় সংসদ গঠনের বিধান রাখা হয়। সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন (পরবর্তীতে সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান যুক্ত করা হয়)।
৬. মৌলিক অধিকার
সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে। বাকস্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতাসহ বিভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
সংবিধানে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের বিধান রাখা হয়, যা নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
৮. লিখিত সংবিধান
এটি একটি লিখিত দলিল, যা পৃথিবীর যেকোনো লিখিত সংবিধানের মতোই একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে।
৯. একক নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্রভাষা
সংবিধানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য একক নাগরিকত্বের বিধান রাখা হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।